মানুষের জীবনে ঈপ্সা ও এষণার সংঘাত বাধে। সে যখন মঙ্গলের বোধকে তার আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তখন ক) তার ব্যক্তিসত্তার দুধরনের অভিব্যক্তির মধ্যে,[৪] খ) তার এষণা ও ঈপ্সার মধ্যে, গ) যে-সকল বস্তু তার ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে এবং যা পাওয়ার জন্য মানুষ তার অন্তরে সংকল্প নিয়েছে, তার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। যা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক তা আমাদের মহত্তর জীবনের জন্য কাম্য। এর সঙ্গে প্রভেদ করলে দেখা যায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক যা-কিছু তার স্থান অনেক নীচে। তাই জীবনে সত্যের নিরীক্ষা থেকেই মঙ্গলের বোধ জাগ্রত হয় যা জীবনক্ষেত্রের পূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের জীবনে বর্তমানে যা রয়েছে বা যা নেই এবং যা হয়তো মানুষ কখনো অর্জন করতে পারবেই না, এ সমস্ত মঙ্গলের বোধের বিবেচনাধীন। মানুষ দূরদর্শী, সে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়, তুলনামূলকভাবে সে তার আপনার জীবনের চেয়ে সেই অনাগত দিনগুলির সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। তাই সে অনুপলব্ধ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান কালে যা আকর্ষণীয় তাও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় কারণ আজ যা মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে কাল তার প্রতি সে কোনো আকর্ষণ বোধ না-ও করতে পারে বা প্রয়োজনের সম্পর্কে জড়িত হলে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে বর্জন করাই হয়। সমস্ত ব্যাপারটি আত্মগত (subjective) অনুভূতি থেকে ঘটে। যে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে সে তার ক্ষণিকের

চাওয়া-পাওয়াকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, এবং এতেই তার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয়। কোনো অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী মানুষকেও তার সত্যকে বুঝে মুহূর্তের আবেগকে সংযত করে তার সংকল্পে অবিচল থাকতে হবে অর্থাৎ তাকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। মানুষ তার নৈতিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে যে জীবন খণ্ডিত অংশের সমষ্টি নয়, বা উদ্দেশ্যবিহীন ও অবচ্ছিন্নও নয়। এই নৈতিক বুদ্ধি দিয়েই সে বোঝে আত্মা কালের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় বা সে গণ্ডিবদ্ধ নয়, যদি সে গণ্ডিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা হলে সে সত্য হয়ে ওঠে না। বাস্তবে মানুষকে যতটা জানা যায় সত্যে তাকে অধিকতর পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তিবিশেষের মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সঙ্গে সংযোগ নেই তাদের সঙ্গেও সে সত্যভাবে যুক্ত। মানুষ যেমনই তার ভাবী সত্তার প্রতি সংবেদী, যা তার বর্তমান চেতনার বাইরে, তেমনই সে তার মহত্তর প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল যা তার ব্যক্তিস্বরূপের গণ্ডির বাইরে। পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই যার এ ধরনের অনুভূতি কিছুমাত্র হয়নি বা কখনো তার নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের স্বার্থ পূরণ করেনি কিংবা অন্যের আনন্দলাভের কারণে কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা ভোগ করেনি।

আমাদের কোন কর্ম ভালো আর কোনটাই বা মন্দ? অনেক কর্ম হয়তো অসাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করা হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সে সব কর্ম যারা করে তাদের মধ্যেও একধরনের ন্যায়ের বোধ আছে যা তাদের কর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। তিনি একটি দস্যুদলের উদাহরণ দেন যেখানে দলের সদস্যরা রীতিমতো বিধিনির্দেশ মেনে চলে এবং এই নিয়ম অনুসরণ করে সততার পরিচয় দেয় এবং পরস্পরের প্রতি তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। নীতিভ্রষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করতেও তার হাতিয়ারগুলিকে নীতিপরায়ণ হতে হয়। রবীন্দ্রদর্শনে যখন আমরা মানুষের নৈতিকতার কথা পাই তখন সেই কর্মের কথাই বলা হয় যে পথে মানুষ মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হয়। সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে যখন সকল মানুষের মধ্যে যোগের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন যে কর্ম সামঞ্জস্য বা যোগের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সেই কর্মই মন্দ। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই নীতিভ্রষ্টতার মধ্যে নীতিশাস্ত্র লক্ষ করেন। তিনি এরপরে নীতিভ্রষ্টতা (non-moral) ও নীতি অনপেক্ষতা (un-moral) -র প্রভেদ নিয়ে আলোচনা

Scanned with CamScanner

করেন। একটি জন্তুর জীবন নীতি অনপেক্ষ কারণ সে তার প্রত্যক্ষ-বর্তমান সম্বন্ধেই সচেতন। তার যে সব জৈবিক চাহিদা আছে তা সে যে-কোনো উপায়ে মেটাতে চায়। এ সব তার প্রবৃত্তি থেকেই জাত, সেখানে কোনো নৈতিকতা বা যুক্তিবুদ্ধি কাজ করে না। মানুষের জীবনে নৈতিক ভিত্তি আছে যা তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, যদি এর বিপরীত কোনো আচরণ সে করে তার বিরুদ্ধে নীতিভ্রষ্টতার অভিযোগ আনা যায়।

যা নীতিভ্রষ্ট তা অসম্পূর্ণভাবে নৈতিক, যেরকম কোনো কিছু মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে তার মধ্যে অল্পপরিমাণ হলেও সত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ক্রমিকতা উপস্থাপিত করেছেন, সত্য বা মিথ্যা, ভালো বা মন্দের মধ্যে ক্রম আছে। তাই মিথ্যা বা মন্দ কখনোই সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বা মন্দ নয়। মানুষ যখন নিজের জীবনটাকে তার স্বার্থের প্রেক্ষিত থেকে দেখে, তখন সে তার মধ্যে কিছু সংযোগ ও উদ্দেশ্যের সূচনা লক্ষ করে, যার নির্দেশে কর্ম করতে আত্মসংযম ও স্বভাবের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। একজন স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নানা প্রতিকূলতা ভোগ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যে যন্ত্রণা ও ক্লেশ সে ভোগ করে তা বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে তার বিপরীত বলে ধারণা হয়। ক্ষুদ্র মানুষ যাকে ক্ষতি বলে মনে করে মহৎ মানুষের কাছে তা লাভ, আবার মহৎ মানুষের কাছে যা ক্ষতি ক্ষুদ্র মানুষ তাকেই লাভ মনে করে।

কোনো মানুষ যখন কোনো আদর্শ, দেশপ্রেম বা মনুষ্যত্বের মঙ্গলের জন্য জীবনধারণ করে তার কাছে জীবন একটি বিস্তৃত অর্থ নিয়ে দেখা দেয় এবং সেই বিস্তার অনুসারে দুঃখ তার কাছে গুরুত্ব হারায়। মঙ্গললাভের জন্য যে জীবনধারণ, সে জীবন সমষ্টির জন্য। ইন্দ্রিয় সুখভোগ সম্পূর্ণ নিজের জন্য, কিন্তু মঙ্গল মানবসমাজের সকলের সুখের সঙ্গে চিরকালের জন্য সংলিপ্ত। মঙ্গলের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে সুখ ও দুঃখের ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়; তখন সুখকে বর্জন করে দুঃখকে বরণ করি এবং তখন মৃত্যুকে স্বাগত জানানো হয় কারণ তা জীবনকে একটা অন্য মাত্রা দেয়। মানুষের জীবনে উচ্চপর্যায়ের চিন্তায় যখন মঙ্গলের দৃষ্টিকোণ থেকে সুখ ও দুঃখকে দেখা হয় তখন তারা তাদের পরম মূল্য হারায়। কবির সংগীত এই ভাবটি ব্যক্ত করে,

Scanned with CamScanner